প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন, সাংবিধানিক কাঠামো ও বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক; ৪ এপ্রিল ২০২৩

প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনঃ

নির্বাচন মানেই সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতামূলক তথা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। একজন ভোটারও যদি তার ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত হন তবে সেই নির্বাচন প্রক্রিয়াকে নিখুঁত বলা যাবে না। সুষ্ঠু পরিবেশে ভোট দিতে পারা এবং স্বচ্ছভাবে ভোট গণনা ও ফলাফল প্রকাশ নিশ্চিত করাই সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, প্রতিযোগিতামূলক তথা গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের অন্যতম পূর্বশর্ত। **সংবিধান বিশেষজ্ঞ মাহমুদুল ইসলামের** মতে, 'আমাদের সংবিধান অনুযায়ী সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের বাইরে অন্য কিছু ভাবার কোনো অবকাশ নেই এবং যে আইন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে কমিশনের হাত বেঁধে দেয়, তা সাংবিধানিক মানদণ্ড পূরণে ব্যর্থ হবে' (কনস্টিটিউশনাল ল অব বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৯৭৩)।

২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিবন্ধনপ্রাপ্ত সবগুলো দল অংশগ্রহণ করেছিল। সব দলের অংশগ্রহণের ফলে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে সবার মধ্যে একটি আশার সৃষ্টি হয়। কিন্তু তফসিল ঘোষণা থেকে শুরু করে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাপঞ্জী সে আশার গুড়ে বালি ঢেলে দেয়। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার ও জাতীয় সংসদের উপনির্বাচনসমূহের একটিতেও বিএনপি ও সমমনা দলগুলো অংশগ্রহণ করেনি। নির্বাচনগুলোতে ভোটার অনুপস্থিতিও ছিল উল্লেখ করার মতো।

নির্বাচন একদিনের বিষয় নয়, এটি একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া – দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন থেকে শুরু করে, নির্বাচনী প্রচারণা, এজেন্ট নিয়োগ, ভোটারদের ভোট প্রদান, নির্বাচনী বিরোধ নিরসন পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়ায় প্রার্থীদের সমান সুযোগ না থাকলে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয় না। নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হওয়ার জন্য সব দলের অংশগ্রহণ প্রাথমিক শর্ত হলেও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, অংশগ্রহণমূলক হলে অনেক সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন হয় না। একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনে একাধিক প্রার্থী বা রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং কোনো প্রার্থী বা দল বিশেষ সুবিধা লাভ করে না। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনে ফলাফল যে কারো পক্ষেই যেতে পারে, যা পুরোপুরি প্রার্থীদের ভোটারদের সমর্থন আদায়ের উপর নির্ভর করে। যে সব নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয় সেগুলোতে ভোট পড়ার হারও বেশি হয়। পক্ষান্তরে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বা একতরফা হলে ভোটাররাও ভোট প্রদানে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। একাদশ সংসদ নির্বাচন-পরবর্তী নির্বাচনগুলো যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হলে ভোটারদের সামনে প্রার্থী বেছে নেওয়ার অর্থপূর্ণ বিকল্প থাকে, ফলে ভোটারদের প্রদত্ত ভোট নির্বাচনের ফলাফলের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখতে পারে।

গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কিছু মানদণ্ড রয়েছে। জাতিসংঘের 'সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ', 'ইন্টারন্যাশনাল কোভেনেন্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস', ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নসহ (আইপিইউ) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ডগুলো হলো: (১) সব রাজনৈতিক দলের জন্য সমসুযোগ সৃষ্টি করতে পারে এমন একটি আইনী কাঠামো থাকা, (২) ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়ায় যারা ভোটার হওয়ার যোগ্য তাদের ভোটার হতে পারা; (৩) যারা প্রার্থী হতে আগ্রহী তাদের প্রার্থী হতে পারা; (৪) ভোটারদের সামনে বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প প্রার্থী থাকা; (৫) নির্বাচনী এলাকার সীমানা কতগুলো মানদণ্ডের ভিত্তিতে সঠিকভাবে নিধারিত হওয়া; (৬) জেনে-শুনে-বুঝে সঠিকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের সামনে যথাযথ তথ্য থাকা; (৭) ভোটারদের ভয়-ভীতির উর্ধ্বে উঠে স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারা; (৮) অর্থ কিংবা সহিংসতার মাধ্যমে ভোটদের প্রভাবিত করার অপচেষ্টা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকা; (৯) ভোট গননা সঠিকভাবে হওয়া; (১০) নির্বাচনী বিরোধ দ্রুততার সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে মীমাংসিত হওয়া; সর্বোপরি (১১) ভোট গ্রহণের প্রক্রিয়া স্বচ্ছ, কারসাজিমুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য হওয়া।

সাংবিধানিক কাঠামোঃ

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পরও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলমান দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। শেষ পর্যন্ত একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। স্বভাবতই সদ্য স্বাধীনতা লাভ করা দেশে প্রণীত সংবিধানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে (১১ অনুচ্ছেদ)। পাশাপাশি সংবিধানের সপ্তম ভাগে নির্বাচন নামে একটি পরিচ্ছেদ রাখা হয়েছে, যেখানে নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা, কমিশনের ক্ষমতা, দায়িত্ব ইত্যাদির বিধান রাখা হয় (১১৮-১২৬ অনুচ্ছেদ)। নির্বাচন কমিশন যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে এজন্য কমিশনকে নির্বাহী বিভাগের অধীনমুক্ত রেখে অগাধ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এমনকি কমিশনারগণ কাজ করতে গিয়ে যেন সরকার কর্তৃক অপসারিত হওয়ার ভয়ে না থাকেন, সেজন্য কমিশনারদের অপসারণের বিধান সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অপসারণের ন্যায় একই পদ্ধতিতে রাখা হয়েছে।

সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে যুক্ত এসব সাংবিধানিক বিধিবিধান সত্ত্বেও বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন ও বিতর্ক সৃষ্টি হচ্ছিল। সব ক্ষমতাসীন সরকারই আপ্রাণ চেষ্টা থাকে নির্বাচনকে প্রভাবিত করে নিজেদের পক্ষে আনার। এমতাবস্থায় নব্বইয়ের গণআন্দোলন পরবর্তী সব দলের ঐকমত্য ও সমঝোতার ভিত্তিতে একটি অন্তবর্তীকালীন সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বিরোধী দলগুলোর আন্দোলনের মুখে ১৯৯৬ সালে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা যুক্ত করা হয়। বস্তুত **তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ছিল নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে দলগুলোর মধ্যে একটি রাজনৈতিক সমঝোতা বা রাজনৈতিক বন্দোবস্ত**। নির্বাচনকালীন সময়ে কোনো দলীয় সরকারের প্রভাব না থাকায় সকল রাজনৈতিক দলের জন্য ক্ষমতায় যাওয়ার সমসুযোগ সৃষ্টি হয়। নির্বাচন হয়ে ওঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক।

রাজনৈতিক বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট নতুন সাংবিধানিক কাঠামোর অধীনে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। অল্প কিছু অভিযোগ থাকলেও সব দল নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেয়। এরপর ২০০৪ সালে বিএনপি সরকার সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতিদের অবসরের বয়সসীমা বাড়িয়ে দিয়ে নির্দলীয় সরকারকে নিজেদের করায়ত্ত করার প্রচেষ্টা চালায়। পাশাপাশি আর একটি নগ্নতম প্রচেষ্টা হয় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে। ফলশ্রুতিতে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচকে কেন্দ্র করে দেশে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অবশেষে মাঝখানের দুই বছর সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারে অধীনে দেশ পরিচালনার পর একই সরকারের অধীনে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্দলীয় সরকারের অধীনে ১৯৯১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত চারটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ২০১১ সালের ১০ মে আপিল বিভাগের এক সংক্ষিপ্ত বিভক্ত আদেশের মাধ্যমে **প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক** 'প্রসপেকটেভলি" বা ভবিষ্যতের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেন। তবে দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়ার অনুমতি দেন। সংক্ষিপ্ত আদেশে বলা হয়: ["The Constitution (Thirteenth Amendment) Act, 1996 ... is prospectively declared void and ultra vires the Constitution. (3) The election to the Tenth and the Eleventh Parliament may be held under the provisions of the above mentioned Thirteenth Amendment on the age old principles, namely, quod alias nomentsn est licitum, necessitas licitum facit (That which otherwise is not lawful, necessity makes lawful), salus populi suprema lex (safety of the people is the supreme law) and salus republicae est suprma lex (safety of the State is the Supreme Law). The parliament, however, in the meantime, is at liberty to bring necessary amendments excluding the provisions of making the former Chief Justices of Bangladesh or the Judges of the Appellate Division as the head of the Non-Party Caretaker Government. The Judgment in detail would follow." ["(২) সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী 'প্রসপেকটেভলি' বা ভবিষ্যতের জন্য বাতিল ও অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করা হলো। (৩) যা সাধারণত আইনসিদ্ধ নয়, প্রয়োজন তাকে আইনসিদ্ধ করে, জনগণের নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ আইন, এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ আইন – এ সকল সনাতন তত্ত্বের ভিত্তিতে দশম ও একাদশ সংসদ নির্বাচন পূর্বে উল্লেখিত ত্রয়োদশ সংশোধনীর অধীনে অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে সংসদ ইচ্ছা করলে এরই মধ্যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে সাবেক প্রধান বিচারপতি বা আপিল বিভাগের বিচারকদের বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে পারে। বিস্তারিত রায় পরে প্রকাশিত হবে।" **অর্থাৎ আদালত পরবর্তী দুই নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা রেখেই তা সংস্কারের প্রস্তাব করেন।** প্রসঙ্গত, আদালতের সংক্ষিপ্ত আদেশ প্রকাশের দেড় মাস পর ৩০ জুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে সংসদে পঞ্চদশ সংশোধনী পাশ হয়।

এর আগে আদালত কর্তৃক পঞ্চম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণার প্রেক্ষিতে সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে ২১ জুলাই ২০১০ বেগম সাজেদা চৌধুরীকে চেয়ারপার্সন এবং সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে কো-চেয়ারপার্সন করে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি বিশেষ সংশোধনীয় কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি দীর্ঘদিন আলাপ আলোচনা ও ১০৪ জন বিশেষজ্ঞ ও রাজনীতিসহ সমাজের সকল স্তরের প্রতিনিধির সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে ২৯ মে ২০১১ – অর্থাৎ আদালতের ১০ মে ২০১১ তারিখের সংক্ষিপ্ত আদেশের ১৯ দিন পর – তিন মাসের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বহাল রেখে সংবিধান সংশোধনের একটি সর্বসম্মত সুপারিশ প্রণয়ন করে। পরদিন ৩০ মে ২০১১ তারিখে বিশেষ কমিটি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর, তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাদ দিয়ে সংবিধান সংশোধনের ঘোষণা দেয়। এরপর **৩১ মে বিশেষ সংসদীয় কমিটির কো-চেয়ারপার্সন ও আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত** সংবাদ সম্মেলন করে উচ্চ আদালত কর্তৃক অবৈধ ঘোষণার কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা রাখা সম্ভব হবে না বলে দাবি করেন, যা ছিল আদালতের রায়ের একটি ভয়াবহ অপব্যখ্যা। একই দিনে এক সংবাদ সম্মেলনে **প্রধানমন্ত্রীও** আদালতের রায়ের একই অপব্যখ্যা প্রদান করেন।

পরবর্তীতে ৫ জুন ২০১১ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলুপ্তির প্রস্তাব করে বিশেষ সংসদীয় কমিটি তার সুপারিশ চূড়ান্ত করে, যার প্রেক্ষিতে ৩০ জুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে সংসদে পঞ্চদশ সংশোধনী পাশ হয়। সংসদে পঞ্চদশ সংশোধনী পাশের ১৬ মাস পর ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে ভবিষ্যতের জন্য অসাংবিধানিক ঘোষণা করে উচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ হয়। পূর্ণাঙ্গ রায়ে সংসদ অনুমোদন করলে দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক

সরকারব্যবস্থার অধীনে দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে হলে – সংসদের সম্মতির প্রয়োজন হবে, **যা ছিল ২০১১ সালের ১০ মে তারিখের সংক্ষিপ্ত আদেশের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ**।

সংক্ষিপ্ত আদেশের প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্য দুটি একত্রে পড়লে এটি সুস্পষ্ট হয় যে দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়াতে কোনোরূপ বাধা ছিল না; বরং তা-ই ছিল আদালতের আদালতের অভিপ্রায়। প্রসঙ্গত, ১৬ মে ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সংসদীয় কমিটির ২৪তম বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে সুস্পষ্ট আলোচনাও হয়, **সাবেক আইনমন্ত্রী প্রয়াত আব্দুল মতিন খসরুর** বক্তব্য থেকে যা অনুমেয়: "রায়ে (আদালত) বলেছে যে, very system of Caretaker Government is ultra vires of the Constitution, it is (prospectively) void. একইসাথে তারা বলেছে, to avoid any such disastrous consequence … and for the safety of the State, for the safety of Democracy, আগামী দু'টি নির্বাচন একই ব্যবস্থায় হতে পারে। তবে একটি জিনিস they have left to the wisdom and consideration of the Parliament যে বিচার বিভাগকে সম্পৃক্ত রাখবেন কিনা অর্থাৎ সর্বশেষ প্রধান বিচারপতি বা যে ৫/৬টি অপশন আছে, এটি করবেন কিনা? বিচার বিভাগকে রেহাই দিবেন কিনা? এটি আপনাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছে।" অর্থাৎ আদালত দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের অনুমতি দিয়ে কে সরকারের প্রধান হবেন সে সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার সংসদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত চূড়ান্ত রায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতিগণ তা থেকে সরে আসেন এবং পরবর্তী দুই নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের জন্য, প্রধানমন্ত্রীর ৩১ মে ২০১১ তারিখে প্রদত্ত অপব্যাখ্যার অনুকরণে, সংসদের সম্মতির শর্ত জুড়ে দেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এভাবে রায় পরিবর্তন ছিল বিচারকদের পক্ষ থেকে ফ্রড-অন-দ্য-কোর্ট বা আদালতের সঙ্গে জালিয়তি ও পেশাগত অসদাচারণ।

পঞ্চদশ সংশোধনী পাশের প্রক্রিয়া এবং সাংবিধানিক বৈধতা:

সংবিধান হলো 'উইল অব দ্য পিপল' বা রাষ্ট্রের মালিক জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তির প্রতিফলন (অনুচ্ছেদ ৭(২))। বস্তুত একটি রাষ্ট্রের সংবিধান নাগরিকদের রাজনৈতিক ঐকমত্যের প্রতীক। তাই এতে পরিবর্তনের – অর্থাৎ সংবিধান সংশোধনের – ক্ষেত্রেও এমন ঐকমত্য থাকা বাঞ্চনীয়। আর এ ঐকমত্য অর্জিত হয় সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রেও জনগণের 'পার্টিসিপেশন' বা অংশগ্রহণ এবং এর পাশাপাশি 'ডেলিভারেশন' বা সুচিন্তিত আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে। মূলত এ দুটি শর্ত অর্জিত হলেই সংবিধানের সংশোধনী 'লেজিটিমেসি' বা গ্রহণযোগ্যতা পায়।

অনেকগুলো কারণেই পঞ্চদশ সংশোধনী পাশের প্রক্রিয়া এবং এর সাংবিধানিক বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ। প্রথমত, পঞ্চদশ সংশোধনীর ক্ষেত্রে গণভোটের আয়োজন করা হয়নি। গণভোট না করার ফলে এর সাংবিধানিক বৈধতা ক্ষুন্ন হয়েছে, কারণ এটি পাশের সময় দ্বাদশ সংশোধনী বলবৎ ছিল, যাতে গণভোটের বিধান ছিল। স্মরণ করা যেতে পারে যে, বাহাত্তরের সংবিধানে গণভোটের বিধান না থাকলেও, পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে তা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যদিও পরবর্তীতে উচ্চ আদালত পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে। তবে গণভোটের বিধানটি আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সমঝোতার ভিত্তিতে দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৯১ সালে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অর্থাৎ পঞ্চদশ সংশোধনী পাশের সময় গণভোটের আয়োজন করা বাধ্যতামূলক ছিল। এ প্রসঙ্গে **গবেষক ও অধ্যাপক রিদওয়ানুল হক** বলেন, "A potential argument for not referring this amendment to referendum was probably that the court had invalidated the Fifth Amendment that adopted the referendum requirement. This argument is unsustainable because the Twelfth Amendment re-enacted the referendum mechanism, with which the Awami League agreed." (সংশোধনীটির বিষয়ে গণভোট আয়োজন না করার একটি সম্ভাব্য যুক্তি হলো যে আদালত পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করেছে, যে সংশোধনীতে গণভোটের বিধান অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ যুক্তি অকার্যকর, কারণ দ্বাদশ সংশোধনী গণভোট প্রক্রিয়াকে পুনরুজ্জীবিত করেছে, যার সঙ্গে আওয়ামী লীগ একাত্ম ছিল।) তাই **সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং অনুচ্ছেদ ৮ সংশোধনের কারণে গণভোটের আয়োজন না করে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাশের প্রক্রিয়া ছিল সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক**।

দ্বিতীয়ত, সংবিধান সংশোধনের গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের জন্য এর বিষয় নিয়ে সুচিন্তিত আলোচনা ও বিতর্ক বা ডেলিভারেশন প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে নিশ্চিহ্ন করার রাজনীতিরই চর্চার ফলে পঞ্চদশ সংশোধনী পাশের ক্ষেত্রে সংসদ ও সংসদের বাইরে কোথায়ও সত্যিকারার্থে সুচিন্তিত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে এটি পাশের পূর্বে বিশেষ সংসদীয় কমিটির উদ্যোগে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের শতাধিক ব্যক্তির সঙ্গে মতবিনিময়ের আয়োজন করা হয়, যাঁদের মধ্যে সাবেক রাষ্ট্রপতি, ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি, বিশেষজ্ঞ, সংসদ সদস্য, রাজনীতিবিদ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, গণমাধ্যমের নেতৃবৃন্দ ও সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যদিও এটি ছিল একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ, কিন্তু বাস্তবতা হলো যে, এঁদের অধিকাংশের মতামত উপেক্ষা করেই সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাশ করা হয়। এমনকি বিশেষ সংসদীয় কমিটির সদস্যগণও তাঁদের ৫ জুন তারিখে অনুষ্ঠিত নিজেদের সভায় এ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

তৃতীয়ত, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাশের ক্ষেত্রে জনমত উপেক্ষা এবং এটি নিয়ে সুচিন্তিত আলোচনা ও বিতর্ক অনুপস্থিত ছিল। শুধু তা-ই নয়, এতে প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কোনোরূপ সম্পৃক্ততাই ছিল না। সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে গঠিত বিশেষ সংসদীয় কমিটিতে প্রধান বিরোধী দল বিএনপির কোনো প্রতিনিধিত্ব ছিল না – বিএনপিকে কমিটিতে একজন প্রতিনিধির নাম দিতে বলা হলেও তারা তা করেনি। বিএনপির চেয়ারপার্শন বেগম খালেদা জিয়াকে বিশেষ সংসদীয় কমিটির সভায় আমন্ত্রণ জানানো হলেও তিনি পুরো বিষয়টিকে দুরভিসন্ধিমূলক আখ্যায়িত করেন এবং তাঁর দল বিএনপি এতে অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকে। তাই **সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী কোনোভাবেই রাজনৈতিক ঐকমত্য বা সমঝোতার প্রতিফলন নয়, বরং এর মাধ্যমে এয়োদশ সংশোধনী পাশের ফলে গৃহীত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা সম্পর্কিত রাজনৈতিক বন্দোবস্তই ভেঙে যায়। গবেষক ব্যারিস্টার আদিবা আজিজ খানের** ভাষায়, "Despite dissent from the opposition, civil society and voters, the AL led supermajority Parliament disregarded the direction given by the Court that the NCG (Non-party Caretaker Government) should remain in place for two more national elections." (বিরোধী দল, নাগরিক সমাজ এবং ভোটারদের বিরোধিতা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ সংসদে তার ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা কাজে লাগিয়ে পরবর্তী দুই জাতীয় নির্বাচনের সময়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বহাল থাকার আদালতের নির্দেশ অমান্য করেছে।)

শুধু প্রক্রিয়াগত অগ্রহণযোগ্যতাই নয়, পঞ্চদশ সংশোধনীর সাংবিধানিক বৈধতা নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে। এই প্রশ্নবিদ্ধতার অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কারণও রয়েছে। প্রথমত, বিশেষ সংসদীয় কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নির্বাহী বিভাগের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর নাকচ করা 'সেপারেশন অব পাওয়ার্স' বা ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির লঙ্ঘন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, নির্বাহী বিভাগের এ হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের সংক্ষিপ্ত আদেশের গুরুতর অপব্যাখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করার ক্ষেত্রে আদালত শর্ত দিয়েছে যে, দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হতে হলে সংসদের সম্মতি লাগবে, যা সঠিক নয়।

দ্বিতীয়ত, পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে অনুচ্ছেদ ৭খ যুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে সংবিধানের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সংশোধনের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সংসদ সংবিধান সংশোধন করতে পারে কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া, যেগুলোকে সংবিধানের 'বেসিক স্ট্রাকচার' বা মৌলিক কাঠামো বলে গণ্য করা হয়। গণপরিষদের মাধ্যমে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সৃষ্টি হয় এবং সংসদ এগুলো সংশোধন করতে পারে না। পঞ্চদশ সংশোধনীতে অনুচ্ছেদ ৭খ যুক্ত করে সংবিধানের এক-তৃতীয়াংশের বেশি অনুচ্ছেদকে অসংশোধনযোগ্য করে এগুলোকে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যা মৌলিক কাঠামোরই লঙ্ঘন। অর্থাৎ **পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে অনুচ্ছেদ ৭খ-এর সংযুক্তি সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।**

তৃতীয়ত, সংবিধানে অনুচ্ছেদে ৭খ-এর সংযুক্তি আরেকভাবেও সংবিধানের লঙ্ঘন। সংবিধানের মৌলিক কাঠামে পরিবর্তন না করে অনুচ্ছেদ ১৪২ অনুসরণে সংবিধান সংশোধন করা সংসদের এখতিয়ার। সংবিধানে অনুচ্ছেদ ৭খ যুক্ত করে এ অধিকার খর্ব করা হয়েছে। সংবিধান বিশেষজ্ঞ মাহমুদুল ইসলামের মতে, "no Parliament can bind the successor Parliament." (এক সংসদ আরেক সংসদের জন্য বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করতে পারে না।)। তাই এটি সুস্পষ্ট যে, অনুচ্ছেদ ৭খ যুক্ত করে আমাদের নবম জাতীয় সংসদ সংবিধানই লঙ্ঘন করেছে। উপরিউক্ত কারণগুলোর বিবেচনায় গবেষক ও অধ্যাপক রিদওয়ানুল হক সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীকে unconstitutional constitutional amendment বা **অসাংবিধানিক সংবিধান সংশোধন** বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এছাড়াও সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীকে বাতিলের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে অবৈধ ঘোষণা করে প্রদত্ত আমাদের উচ্চ আদালতের সংক্ষিপ্ত আদেশের সংবিধানিক বৈধতাও চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। সংক্ষিপ্ত আদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে তা পরবর্তী দুই মেয়াদের জন্য জীবিত রাখা হয়েছে, যা **সংবিধান বিশেষজ্ঞ মাহমুদুল ইসলামের** ভাষায়, আইনের শাসন ও ৰমতার পৃথকীকরণ নীতির পরিপন্থি। তাঁর মতে: "It is submitted that by …providing the rider clause giving life to the discredited system for the next two parliamentary elections, the Appellate Division made judicial legislation interfering with the functions of Parliament assigned by the Constitution and thereby dented the well-established constitutional jurisprudence and acted contrary to the rule of law and separation of powers." (আমরা মনে করি যে, একটি নিন্দিত ব্যবস্থাকে আগামী দুই সংসদ নির্বাচনের জন্য জিয়িয়ে রেখে আপিল বিভাগ বিচারিক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আইনসভার সংবিধান প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের ওপর হস্তক্ষেপ করেছেন, যা সুপ্রতিষ্ঠিত সাংবিধানিক আইনশাস্ত্র, আইনের শাসন ও ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির পরিপন্থি।) এছাড়াও আদালত তার রায়ের মাধ্যমে রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছেন, যা 'পলিটিক্যাল কোয়েস্চান ডকট্রিনের' সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎঃ

নির্বাচন গণতন্ত্রের একটি গুরত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। নির্বাচন ক্ষমতা পরিবর্তনের পদ্ধতি হওয়ায় সাধারণত দলগুলো চায় নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে। সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের বদলে প্রভাবিত ও একতরফা নির্বাচন করতে গেলে নাগরিকদের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করতে হয়, যার নজির আমরা বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি। ফলে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেমন হচ্ছে তার ওপর বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে। বস্তুত, গত দুটি নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে এটি বলার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে যে, সংসদকে বহাল রেখে দলীয় সরকারের অধীনে ভবিষ্যতের নির্বাচনও অগ্রহণযোগ্য হতে পারে এবং এর ফলে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের চরম হুমকীর মুখে পড়তে পারে।

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক তথা গ্রহণযোগ্য করতে হলে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত গড়ে তোলা আজ জরুরি। নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তে যা থাকতে পারে তা হলো: ১. নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা নিয়ে ঐকমত্য, ২. সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক সংস্কার, ৩. জাতীয় সংসদ, নির্বাচন কমিশন-সহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা, কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, ৪. আইনের শাসন নিশ্চিত করা ও মানবাধিকার সংরক্ষণ, ৫. রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন এবং একটি 'জাতীয় সনদ' প্রণয়ন।

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20230404102247+06’00’)
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20230404102247+06’00’)
/CreationDate
(NIS-PROJECT-2)
/Author
-mark-